প্রথম প্রকাশ
৯ই ভাদ্র ॥ ১৩৭৫

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

সুহৃদ্‌বর সুকবি সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের
স্মৃতির উদ্দেশে—

৯ই ভাদ্র ॥ ১৩৭৫

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

। পথের গান ॥

প্রথম পর্যায়-এর কবিতাগুলি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলেও পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা নয়। এ পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীশুভেন্দু ঘোষ নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় পর্যায়-এ বিশেষ করে পত্র-পত্রিকার জন্যেই লেখা. কয়েকটি কবিতার নমুনা দেওয়া গেল।

পথের গান

প্রথম পর্যায়

॥ এক ॥

দূরে যবনিকা কাঁপে থরোথর,—আঁখি চপল !
বাড়ায় দু'খানি ব্যগ্র হাত,
চাঁদের আলোক, ঘুমে ঢুলু ঢুলু তারার দল,
তন্দ্রা জড়ানো সন্ধ্যারাত ।
অজানা ব্যথায় টলমল দূর দিক্‌চক্রের শেষ সীমায়
ঝাপ্‌সা আলোর ঘোমটার তলে একটানা কালো রাত ঝিমায় !
মদিরেক্ষণে ! চেয়ে দেখো লাল ধূমকেতু নাড়ে পুচ্ছ তার
অগ্নিদাহন জ্বালার ঘায়,
এ আলো আগুনে ঝলে আতঙ্ক, আসন নড়েছে ধ্রুবতারার,
কাঁপে মহাকাল আশঙ্কায় !

সবুজ পাতায় আলোর প্লাবন ছায়া উধাও ?
কুহেলি-বসন-ঘোমটা খোল্‌,
বাতায়ন পথে দু'চোখ চপল ছাড়িয়া দাও—
বনের বাসনা ঘনায়ে তোল্‌ !
ক্রন্দন শোন, কামনার ছায়া-সঙ্গীত দূর আকাশে লীন,
বনের সীমানা—ওই কিনারায় কম্পনদাগ মেঘে বিলীন ।
দুর্দিন না কি ! মায়া পিঞ্জরে দীর্ঘশ্বাসের উঠিছে ঝড়—
স্নেহ সুশীতল ছায়া বিছাও !
ঘুমানো আকাশ,—নরকংকাল প্রেতেরা হানিছে শেষ-কামড়,
ভীরু ! দু'টি চোখ তুলিয়া চাও ।

দেখ চেয়ে ওই,—রাতের প্রান্ত তীরে আঁধার
চরভূমি আর বালু-পাহাড়,
ভয় পেয়ো নাকো,—রাশি রাশি ঢেউ হইব পার
শক্ত দু'হাতে টানিয়া দাঁড়।
কান পেতে শোন, নিষ্ঠুর হাসি ফিরে জুড়ি' সারা আকাশতল
দূরে বিভীষিকা ফিরে নাচি' নাচি'। তপ্ত শোণিত ভয়-শীতল!
কাঁপিয়ো না বধূ, শঙ্কা-কাতর রয়েছে গভীর আঁধার রাত—
তারার কান্না মূক ভাষায়,
দুঃখের রাত,—আঁধারে ছলনা কবে দূরে ফিরে সুখ-প্রভাত,—
তিমির-রক্ত চোখ শাসায়!

কালো চুলে তব আঁধার-কণিকা বাঁধে জমাট—
চোখের তারায় জমাট ঘুম,
রাত্রি বিছানো দিগন্তে মেশা ক্লান্ত মাঠ—
দু'চোখে ঘুমায় আলো নিঝুম!
কি দেখিছো থেমে,—মানুষ পশুরা মরেছে কি এতে চমকাবার
লোভী শাসনের ক্রূর পদতল—খর নিষ্ঠুর এ অহঙ্কার।
নিরাশ হয়ো না,—মানুষ দিতেছে মানুষের গড়া পাপের দাম,
জমা অভিশাপ শতাব্দীর!
পথের এ ঝড়,—আমরা দু'জন কখনো হবো না ব্যর্থকাম,
নিশ্চয় জেনো রয়েছে তীর।

সুন্দরী, বহু দূরে তটরেখা—সিঁদুরে মেঘ—
বিহ্বল চোখে ছায়া-আবেশ,
ঝড়ের আভাস—তরঙ্গফেন স্রোতের বেগ—
দেখিতে পাও কি পথের শেষ?

ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ চিক্কণ ক্ষীণ আলোকের খেলা দেহলীলায়
জীর্ণ তরীর দাঁড় জোরে ধরো—দিবসের শেষ আলো মিলায়।
হতাশ হয়ো না, দুর্দিন-ঝড় হেলায় আমরা হইব পার—
মানুষের গড়া দুঃসময়!
হাহাকার শোনো, মানুষ শোধিছে যুগের পাপের কঠিন ধার
বিহ্বলে, চলো—কিসের ভয়?

মনে পড়ে বধূ আমাদের সেই বাসর রাত?
মোদের প্রথম যাত্রাদিন!……
বাতায়ন পথ,—তারার আলোর বাড়ানো হাত,—
আকাশের চোখ পলকহীন।
তার পর চলা। দেখো তারকায় কান্নার মেঘ ঝরে বিপুল,
সেদিনের চাওয়া আকাশের চোখে কোথাও রয়েছে মস্ত ভুল!
অশ্রুসজলে! চোখ মোছ আমি এই রাখিলাম পথের গান,
দৃষ্টি সুদূরে ছাড়িয়া দাও,—
মনে পড়ে বধূ প্রথম প্রভাত? ··যাত্রা মোদের নিরবসান,···
কোন্ বন্দরে ভিড়াবে নাও?

—১৯৪৬

॥ দুই ॥

এখনো সময় হয়নি বন্ধু,—এখনো নয়,
এখনো দিনের অনেক বাকি,
আকাশ প্রান্তে আঁধার রয়েছে—রয়েছে ভয়—
ঘুমায় হাজার ভোরের পাখী।
তিমির রাতের তীর্থে করিতে মহাপ্রয়াণ
মুখে চেয়ে-থাকা তারারা করেনি আত্মদান
পান্থশালার দুয়ার খোলেনি—এখনো দূর
পথের নিশানা এখনো নাই,
অন্ধরাতের ঘোমটা খোলেনি দিগ্বধূব
একটু দাঁড়াও এখনো ভাই।

বিপ্লব-ঝড় উঠেনি—উড়েনি জটা বিশাল,
আকাশে ছড়ানো রুক্ষকেশ
ধিকি ধিকি জ্বালা ভ্রূকুটিকুটিল রুদ্রভাল
কোথা নটরাজ নৃত্য-বেশ?
সমুদ্র দোলে আকাশ সাগরে দোলে তুফান
পূর্বাভাসের পরশে ধরণী মুহ্যমান!
ভীরু আঁধারের বক্ষ কাঁপন স্পন্দহীন
গর্ভ-গহনে অধীর কাল,
আভাস পেয়েছো? আঁধারে বন্ধু বিলীন দিন
টুটেনি রাতের অন্তরাল।

তিমির শয়নে ঘুমায় সূর্য—বহ্নিচোখ,—
তিমির শয়নে ঘুমায় দিন,
আঁধার-বিছানো আকাশের তলে বিশ্বলোক
ভবিষ্যতের স্বপ্নে লীন।
বাতাসে ভাসিছে নামহীন কোন্ কথার সুর
সমুখে ঝিমায় অলস রজনী তন্দ্রাতুর।
দাঁড়াও বন্ধু, কোন্ দুর্গমে যাত্রাপথ?
মুছেছে পথের চিহ্ন-লেশ,
ঘুমায় রজনী,—তিমির-শয়ান ভবিষ্যৎ
আঁধারের তলে ঘুমায় দেশ।

এখনো সময় হয়নি বন্ধু,—এখনো নয়—
এখনো পথের ঠিকানা নাই,
বহু মৃত্যুর পরপারে আছে সূর্যোদয়
বহু মরণের ওপারে ভাই!
দিনের জন্ম আকাশের কোলে প্রতীক্ষায়,
অধীর সাগর অন্ধ আবেগে তাহারে চায়,
সাগরে কাঁপিছে—আকাশে কাঁপিছে তাহারি সুর
মুক্তি মাগিছে অসীম কাল,
শুনেছো বন্ধু? একটু দাঁড়াও এখনো দূর—
কাটেনি রাতের অন্তরাল।

—১৯৪৫

॥ তিন ॥

কোথায় উঠেছে শুক্লা রাতের তারা
মিলন রাতের কোথায় উঠিল চাঁদ,
কে জানে সে-কোন্ দিগন্তদেশে হারা
দীর্ঘ দিনের তিমিরের অবসাদ !
এসেছে জীবনে নবযৌবন—তারে—
এসেছি কি অভিনন্দন জানাবারে ?
স্বপ্ন-বিমুখ বহু বরষের পর
জীবনে এলো কি আলোকের অভিসার,
ফিরিবে জীবনে জীবনের সহচর ?—
নিজেরে একথা শুধাই বারম্বার ।

বন-পল্লবে সবুজের বাহুডোর—
আনন্দ-ঘন জীবনে আলিঙ্গন,
লাল বাসনার পরশ আবেশ ঘোর
ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলনের বন্ধন !
মুকুলিত দেহে ফুলশাড়ী দিল টানি'
রূপের সভায় রূপের রাজেন্দ্রাণী ।
যত্ন-খচিত প্রসাধন সম্ভারে
সজ্জিত বেশে বহিরঙ্গনে নামি'—
তীর প্রান্তরে দাঁড়াইয়া একধারে
মুগ্ধ চক্ষে ক্ষণকাল রহি থামি' ।

নির্মল রাত—নির্জন আলোরেখা
নদীর বুকের শুক্‌নো বালুর চরে,
প্রান্তর পারে রয়েছি দাঁড়ায়ে একা
দেখেছি আলোর আবেশ-স্বপ্ন ঝরে।
ধূধূ পিপাসায় কাঁপিতেছে মরীচিকা
হাজার যুগের ক্রন্দন ধ্বনি-লিখা।
আকাশ হইতে ঝরে পড়া রাশি রাশি
দীর্ঘশ্বাসের ছায়া-কংকাল ভাসা,
দিগন্ত-তীরে মুগ্ধ রাতের হাসি
বিদ্রূপে ভরে জগতের ভালোবাসা!

দাঁড়ায়ে রয়েছি প্রিয়-সমাগম লাগি'
তীর-প্রান্তরে যুগ-যুগান্ত ধরি'
কখন ওপারে উঠিবে আলোক জাগি'
অপলক চাওয়া দুইটি নয়ন ভরি'।
কঠিন আঁধার আঁখি-পল্লবে নামি'
করেছে অন্ধ কখন জানি কি আমি?
পড়িতেছে মনে দূর অতীতের কথা
জ্যোৎস্না বিছানো সে এক ফাগুন রাতি—
দুইটি পরাণে একখানি আকুলতা
যেন রে সেদিন করেছিল মাতামাতি।

মনে পড়ে আজ সেদিনের সব কথা
দাঁড়ায়ে এখানে মহাশূন্যের তলে,
বিরহ-বিমুখ মনে পড়ে অধীরতা
মুক্ত কোরক মুগ্ধ হৃদয়-দলে।

একটি পরাণ স্বপ্ন-পরাগে মম
বাসনা সাগরে ফুটেছিল অনুপম।
মনে পড়ে আজ সেদিনের যত কথা
স্মৃতির দুয়ারে কঠোর আঘাত হানি',-
কাঁপিছে বক্ষে বিস্ময়-ব্যাকুলতা—
কাঁপিছে বেদনা—মর্মে কাঁপিছে বাণী

বিস্মরণের বন্ধ দুয়ার খুলা
শিথিল-গ্রন্থী হয়ে আসে একে একে,
জীবনের মুখে সোনার স্বপ্নগুলা
হাস্য-মুখর আশ্বাস গেল রেখে।
মুখর জ্যোৎস্না নভোতল আলোময়
প্রিয় মিলনের এসেছিল সু-সময়!
সেদিন রজনী রক্তে কাঁপন-জাগা
ভীরুকামনার সলাজ মধুর সুর
দুইটি পরাণে একখানি ভালো লাগা
এক পরাণের স্পন্দনে ভরপুর।

দেহ জেগেছিল মন্দার মালিকায়
সাড়ায় সাড়ায় সচেতন দেহদল,
যৌবনভরা স্বর্গের বালিকায়
ছড়ালো ধরায় স্বপ্নের পরিমল,
মধুর পরশ দূরের বাঁশীর মত
তুলেছে রক্তে তরঙ্গ অবিরত।
তার পর কবে ছিন্ন হয়েছে তার
বাস্তব এলো শাসন-দণ্ড হাতে,

কেড়ে নিল মোর চির-পাওয়া অধিকার
বসন্তভরা সে-এক জ্যোৎস্না রাতে।

দ্রুত এলো নামি' আঁধার কালোর সুর
রাশি রাশি কালো ঢেকে দিল দশদিক্—
অর্ধ-চেতন ভ্রমিয়াছি বহুদূর
তন্দ্রালু চোখ চেয়ে থাকা অনিমিখ,
আকাশযানের পক্ষে জমায়ে পাড়ি
দেশবিদেশের দিগন্ত-রেখা ছাড়ি।
শত জীবনের অযুত অচেনা পথে
ঘুমানো যুগের জমানো আঁধার রাশি,
পথের ঠিকানা মিলিল না কোনমতে—
ঝিমায় প্রহরী—কোথা সন্ধানী বাশী?

বঞ্চনাময়ী রজনীর সহচর
চিরবঞ্চিত-আঁধারের ছলনায়
গতি-উদাসীন ধরার বুকের 'পর
বহুদিন হল দিন আসে দিন যায়!
কলঙ্কমাখা দূর আকাশের চাঁদে
আমার কামনা ফিরিয়া ফিরিয়া কাঁদে।
মনে হল এই ধরণী আমার নয়
আমার পৃথিবী অন্য কোথাও হবে,
বিস্মৃত সুরে ভেসে আসা পরিচয়
হয়েছিল জানি—পড়িল না মনে কবে।

জানি না কখন সন্ধ্যা এসেছে নামি'
কখন উঠেছে প্রভাতের শুকতারা,

পাখীর কাকলী কখন গিয়াছে থামি'—
আলোর পরশে উঠেছে জাগিয়া কা'রা।
দিবসের পরে দিনেরা এসেছে কি না—
জেনেছি কাদেরে—কাদেরে হল না চিনা।
কাটিয়া গিয়াছে মানুষের সন্ধানে
বিহ্বল মোর একাকার দিনরাতি,
পাইনি দেখিতে কোথা বসে—কোনখানে—
গোপন আলয়ে গোপন প্রাণের সাথী।

নদীর এপারে আজি উঠিয়াছে চাঁদ
ওপারে আঁধার ঘনমসী-কালো রেখা,
মাথার উপরে শত তারা-ধরা ফাঁদ
তীর-প্রান্তরে রয়েছি দাঁড়ায়ে একা।
তেমনি ফাগুন মুঞ্জরি' গাছে গাছে
বনের বুকের মাঝখানে মিশে আছে।
বহিছে বাতাস আজিও গন্ধ মাখা
বিগত দিনের ভুলে যাওয়া স্মৃতি সম,
পলক বিহীন দু'আঁখি চাহিয়া থাকা
কোথা প্রিয়তম—কোথা তুমি প্রিয়তম।

—১৯৪২

॥ চার ॥

বিস্ময়ভরা দু'চোখ মেলিয়া কতো কিছু দেখিলাম
হে ধরণী, আজ কেমনে বলিব কি তাদের ছিল নাম।
আমার দৃষ্টিতল—
নামের বাহিরে দেখেছে তাদের রূপরেখা ঝলমল।
বুকের কিনারে রয়েছে গোপন অপলক চাওয়া আঁখি
ধরণীর শত দুলালী কন্যা ফিরে গেছে ডাকি' ডাকি',
চেয়ে আছে অবিরাম—
সময় কোথায় জানিতে শুধায়ে কি বা তাহাদের নাম।
অলস প্রশ্নে কি জানি কখন ফাঁকি দিয়ে যায় কে বা
হারাবে যে ধন চিরকাল তরে শূন্যে তা' মিলাবে বা।
তাই তো হল না পরিচয় মোর কারো সাথে কোনোদিন
অপরিচয়ের চিহ্ন ধরিয়া শেষ হয়ে যায় দিন।

বিস্ময়ভরা চোখ—
দেখেছি বিশ্ব উড়িছে ছাপায়ে আমার শূন্যলোক,
তরল হইয়া ছুটিছে কি এক কলকথা নদীজলে
দেখেছি ফুলের গন্ধ গলিয়া উড়িতে আকাশতলে,
আগুন লেগেছে অশোকে পলাশে—সারা বনভূমি পোড়া-
রূপের আসর সাজানো দেখেছি প্রাণের বাসর জোড়া।
দেখেছি তোমার নির্মলদেহ-ঝরা লাবণ্য রাশি
পলক ফেলিতে ফেলেছে সকল বিশ্বভুবন গ্রাসি'।

দেখেছি তোমার দু'আঁখি বিশাল বিদ্যুৎ বেঁকে চলে
অন্তরে মোর তব অন্তর কতো কথা যায় বলে।
তোমার দেহের ইশারা দেখেছি বিশ্বের ইশারায়
তোমার চেতনা লুটায় ধূলায় পথমাঝে পায় পায়।
মেলি উৎসুক আঁখি
সকলি দেখেছি আফসোস শুধু তুমি রয়ে গেছো বাকি।

—১৯৪২

তুমি ক্ষমা করো মোরে
তোমার জ্যোতির জয়টিকা
মনের আকাশ 'পরে
যা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে লিখা
আমি যদি নাহি পারি
দিতে তারে মনোমত বাণী
তুমি দিয়ো ভাষা তারি—
নিয়ো ঊর্ধ্বে ভূমি হতে টানি'।

—১৯৪২

[কবিবন্ধু শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী ও শ্রীশুভেন্দু ঘোষ চার সংখ্যক কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ দু'টি পরিশিষ্ট খ-তে দেওয়া গেল।]

॥ পাঁচ ॥

স্বপ্ন-শয়নে তব—
জীবনের নব মধুমাসে আসি' তোমারে চিনিয়া লব।
তোমারে যে চাই এ কথাটা আমি ভুলিব বলো কি বলে,
ভুলিব কেমনে এক দিন তুমি ভোলায়েছ কতো ছলে।
তোমারে চেয়েছি ধরিতে আমার দুইটি নয়ন দিয়া
রূপের মাঝারে ছুঁয়েছে নয়ন গেছ তুমি পলাইয়া।
ভেবেছি তোমারে এক দিন আমি আমার কথাটি ক'বো—
তব জীবনের ফাল্গুনে আমি তোমারে চিনিয়া লবো।

সে দিন গিয়াছে চলে—
যে দিন জীবনে তোমার বার্তা রটেছিল পলে পলে।
যৌবন দিন জীবনে এসেছে জমায়ে পথের পাড়ি
শূন্য ঝুলিটি ভরিতে বাহিরে ছুটিয়াছি তাড়াতাড়ি।
কতো দিন আর রজনীর পথে ভ্রমিয়াছি দেশে দেশে
নূতন নূতন মানুষের মুখে হাসিয়াছি ভালোবেসে,
ভিক্ষাপাত্র বহিয়া ফিরেছি জগতের ঘরে ঘুরে
দিনরাত চেয়ে ফিরেছি পাগল কামনার পথ ধরে।
কতো পাইলাম তবু তো আমার ক্ষুধা মিটিল না কিছু
ব্যর্থ বাসনা ফিরিল অচেনা জগতের পিছু পিছু!
যারা দিল রাশি রাশি—
তাদের কিছু কি আমার চয়নে পরশ রাখেনি আসি?

তাহাদের মুখে আমার হাসিও শূন্যে মিলায়ে গেল ?
ভাবিতেছি আজ কি পেয়েছি আমি—কি বা তাহারাই পেল !
এ কথাটা তবে থাক—
নেওয়া দেওয়া যদি শূন্যে মিশায় শূন্যেই তা মিশাক।

এসেছে হলুদ দিন—
তরুমর্মরে কাঁদিয়া উঠিছে বনানী বিরামহীন,
ফুলশাড়ী পরা ধরণীর দেহে যৌবন দোলা লাগে
কাঁপে নামহীন ব্যথার স্পর্শ চঞ্চল অনুরাগে।
কোন্ ধনখানি দিতে
স্বপ্নের জাদু ছড়ালো এ দিন বর্ণের দীপালীতে ?
এ দিন আমার নয়—
আমার কামনা গুমরি ফিরিছে বিশ্বভুবনময়।
স্বপ্ন-শয়নে তব—
আর জীবনের নব মধুমাসে তোমাবে চিনিয়া লব।

—১৯৪২

তুমি মোরে দাও বাণী
সেই বাণীপথে চিরদিন
আমার প্রকাশখানি
চলিতেছে বিরামবিহীন।

—১৯৪২

॥ ছয় ॥

তোমায় ঘিরে ভবিষ্যতের ফসল ফলে
আমায় ঘিরে ভবিষ্যতের জ্বলছে আলো ;
চুপ করো,—আজ কি হবে শেষ কথায় বলে
আজ আমাদের যুগের শাসন মানাই ভালো।
চারদিকে আজ ফাঁকা আওয়াজ শুনছো না কি-
দেখছো না কি ছুটছে মানুষ শূন্যে মোহে,
আজ আমরা চুপ করেই হেথায় থাকি'
নীরব দু'টি নয়ন মেলে দেখবো দোঁহে।
কাজ কি বলো আজকে মোদের কথায় বলে
কেহই যখন শুনবে না আজ মোদের কথা,
যাক না এ দিন যেমন যাচ্ছে তেমনি চলে—
কাটবে এ যুগ—ভাঙবে মোদের নীরবতা।

হাহাকার আর ধ্বংসে কাঁদে ধরার ধূলি
রক্তরাঙা বিশ্ববধূর আলতারেখা,
মিথ্যা আজি পঞ্চশীল আর প্রেমের বুলি
ক্ষিপ্ত জগৎ পাবে না আজ আলোর দেখা!
ধরার মানুষ নরকপুরের কবর খুঁড়ে
মৃত্যুমুখী মহাকালের মহোৎসবে।
হিংসারাশি হাওয়ার পাখায় চলছে উড়ে
চোরজুয়াচোর ডঙ্কা বাজায় অট্টরবে!

মিথ্যা ফাঁকির পরমায়ুর ক'দিন মেয়াদ ?
যাক না কেটে, চুপ করে আজ থাকাই ভালো ;
কাটবে এ দিন—কাটবে বাধা—ভাঙবে এ বাঁধ—
কাটবে আঁধার—হাসবে আবার আশার আলো !

সে দিন মোরা গড়বো নূতন পৃথ্বীটারে
দম্ভ এ নয়, শোনাক না তা শোনায় যদি !
বাঁচবো মোরা—বাঁচবে ওরা মোদের ধারে
মোদের প্রেমের নজির টেনেই নিরবধি।
আঁধার-ঘেরা প্রত্যাশারি রাত্রি শেষে
জাগবে প্রভাত দিনের পূর্ব তোরণ-দ্বারে,
নূতন দিনের সৌধচূড়া আকাশ ঘেঁষে
আমরা দু'জন তুলবো গড়ে সারে সারে।
সে দিন মোরা বলবো মোদের যতেক কথা
চলবে সে যুগ মোদের কথার শাসন মেনে,
আজকে মোরা ভাঙবো না এই নীরবতা—
আজকে মোদের কাজ কি সে-সব কথায় এনে।

আসবে সে দিন মানুষ জাতির গর্ব নিয়ে,—
ভবিষ্যতের দোহাই যদি দিয়েই থাকি
লজ্জা পাবার সত্যি বলো কারণ কি এ ?
বর্তমানের আগল মোরা ভুলবো না কি !
কী বাঁধনে বেঁধেছে তা পৃথ্বীটারে
সে তো মোদের দেখা—সে তো মোদের জানা,—
ভবিষ্যতে তাই তো তাকাই বারে বারে
এ ছাড়াও আছে আরো কারণ নানা।

তোমার মাঝে অফোটা যে রইলো কলি
আমার মাঝে যে আলো আজ নিভছে ধীরে,
সে-সব যদি আজকে আমি নাই বা বলি—
ফসল তাহার ফলবে ভবিষ্যতের তীরে।

—১৯৪২

তুমি যে বলেছ তুমি আমারেই শুধু ভালোবাসো
এ কথা যদিও মিথ্যা তবু তাতে কিছু নাই দোষ,
কাছে এসে ফিরে যাও—তবু সত্য কাছে তুমি আসো—
এরি মাঝে রহিয়াছে আত্মার পরম পরিতোষ।

বিভ্রম জাগায় মনে তোমার প্রণয় নিবেদন
মিছে যদি হয় তাহা বলো তাতে কি বা আসে যায়।
নয় মিথ্যা আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর মিলন,
তারো মাঝে সত্য আছে—শাশ্বতের স্বাদ পাওয়া যায়।

—১৯৪২

॥ সাত ॥

আমার জীবনে দিয়ো
তোমার পরশ আনি',আনি',
তোমাতে আমারে প্রিয়ো
নিয়ো টানি'—নিয়ো টানি' !
যেখানে যূথীর রাশে
তোমার মাধুরী হাসে,
যেখানে সবুজ ঘাসে
ডাক দেয় হাতছানি'।
আমারে তোমার মাঝে
নিয়ো টানি'—নিয়ো টানি'।

জানি না তো আমি বঁধু
আমার জীবনে কবে
পরম লগনে মধু
মিলন আরতি হবে।
জীবনের দেশে দেশে
সুরভি আলোয় মেশে
আমাদের ভালোবাসা
সার্থক হবে জানি।

যে দিন মিলাবে আলো
নয়নের পথ হতে,

নামিবে আঁধার কালো
আকাশের বাঁকা পথে !
শঙ্কা-পীড়িত মনে
কেঁপে উঠি অকারণে,
দূর হতে নিয়ো ধরে
কম্পিত মোর পাণি,
সে দিন আমারে বঁধু
নিয়ো টানি'—নিয়ো টানি' ।

—১৯৪২

জীবনের ধ্রুবতারা যেন নাহি নিবে
অকম্পিত আলোধারা ধরার ত্রিদিবে
নিত্য অভিষিক্ত করি' দিক দিব্য চোখ—
অন্ধকার বিভাবরী মোহমুক্ত হোক !

—১৯৪২

॥ আট ॥

শেষবার—
তোমার কাহিনী আমি রেখে যাবো,
রাখিব আমার স্বাক্ষর তাহার নীচে,
বজ্রের লিপিতে লেখা নাম
কঠোর বিদ্যুৎ-গর্ভ—
মুছিবে না কোন দিন সে স্বাক্ষর সত্য কহিলাম।
তার পর রবে নাম, কাল যাবে কালান্তরে মিশে
যুগান্তের সন্ধ্যারবি সে নাম দেখিবে অনিমিষে।
আমি পৃথিবীর শেষ কবি
কিংবা অবশেষ—
যে জেনেছে, যে লিখেছে, যে পেয়েছে তোমার উদ্দেশ।

মনে রেখো—
এর পর তোমার কাহিনী হবে মিছে,
যাহারা আসিবে মোর পিছে
জানিতে চাবে না তারা কি তোমার সত্য পরিচয়—
দেখেও তোমারে তারা মনে মনে করিবে সংশয়,
হারানো পথের রেখা তাহারা পাবে না আর খুঁজি'
দুর্বহ জীবন আর মিথ্যার বেসাতি হবে পুঁজি।
তার পর একদিন মিথ্যাই সত্যের পরি' বেশ
রবে অবশেষ।

তাই—
শেষবার আমি কবি তব গান আজ গেয়ে যাই।

তার পর—
দীর্ঘ যুগ ধরি'
ঘুমাবে শর্বরী!
ঝিল্লিমন্দ্র মুখরিত আঁধার-বিছানো এক রাত—
দীর্ঘ রাত্রি একটানা একা—
ঘুমন্ত পরীর পাখা মৃত্যুনীল কল্পনার রেখা।
অবসাদগ্রস্ত রাত্রি বিবর্ণ বিমুখ
তারাহীন রজনীর অন্ধকার মুখ!
কালো ব্যথা টলমল অমানিশা রাতে
কল্পান্তের তোমার আমার তপস্যাতে
হয় তো জন্মিব পুনঃ—
কে বলিবে সত্য কি না আশা?
তাই আজ দিয়ে যাই তোমার বাণীরে মোর ভাষা।

—১৯৪২

এই ধরণীর তীর্থে মোর গানখানি
প্রাণের পরশে নব প্রাণ পাবে জানি।
মানুষের মাঝখানে মোর রূপলোক
আনন্দের অভিসারে প্রকাশিত হোক!

—১৯৪২

॥ নয় ॥

আত্ম-নিবেদন ঝলি' উঠা ওই দু'টি
বিশাল-আয়ত-আঁখিপদ্মে
কি বার্তা দেখি নাই বেগে চলিয়াছি ছুটি'
সুন্দরী অয়ি অনবদ্যে !
পরিচয়হীন দেশে প্রচণ্ড ক্ষমতায়
চলিয়াছি মহা-অভিযাত্রী
পন্থ-গহন টানে অন্তিম মমতায়—
পথ-সম্মুখে কালো রাত্রি !
জীবন-ব্যবচ্ছেদ যবে হয় পলে পলে
অন্তরে দুরাশা-দাবাগ্নি
অলক্ষ্য রাক্ষসী টেনে নেয় ভীম বলে
মিটাতে কঠোর জঠরাগ্নি ।

ওগো সহযাত্রিণী কোন কথা রূপ পায়
বাসনা-বিলম্বিত চক্ষে,
যৌবন-নিপীড়িত উচ্ছল পেয়ালায়
কি আসব ঢাকা দেহ-কক্ষে,
সজ্জিত মন্দিরে রজনীর সহচরী
শয্যার সঙ্গিনী নব্যা,
উন্মুখ কামনা-বিকম্পিত দেহতরী
হে সুলভে ! হে সহজ লভ্যা !

জানিতে চাহিনি তব অন্তর দীপে জ্বলে
কোন্ কামনার মহাবহ্নি
অপাঙ্গ-আঁখি কোণে কি বার্তা উঠে ঝলে
ওগো সহযাত্রিণী—তন্বী !

ফিরিবার নাহি পথ পশ্চাতে চাওয়া মিছে—
মিথ্যা এ প্রলুব্ধ-দৃষ্টি !
তোমার তরুণদেহ কামনায় বিরচিছে
আনন্দ-ঘন অনাসৃষ্টি ।
রতি-সুনিপুণে, তব সজ্জা-বিলাসে রটে
মকরকেতুর জয়যাত্রা
আমার পথের দিশা হারায় ও দেহতটে
সুখ-বিস্মৃত বোধ মাত্রা !
রাত্রির অবসানে তোমারে হেরিব জানি
ভুক্তাবশেষ-দেহ——রিক্ত,
যাত্রা পথেতে মোর একতারা লব টানি',—
আঁখি-পল্লব তব সিক্ত !

নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত গমনমুখর মোর
পথ বুঝি হয় অবরুদ্ধ
পেছনে ধাইছে তব দৃষ্টি চপল-চোর
চকিত-চাহনি-রেখা সুদ্ধ !
উদ্দেশহীন পথ অলক্ষ্য নাগপাশে
লইতেছে আমারে আকর্ষি'
সজল ও দু'টি চোখ আমারে ঘিরিয়া হাসে
কল্যাণ-অমৃতে বর্ষি' !

তৃপ্তির লেশহীন হৃদয়ের তলদেশ,—
অনুভব করি মহাসত্যে,
মনে হয় সব যদি হয় হোক নিঃশেষ—
কি লাভ হইবে লভি' তথ্যে ?

আজ ভাবিতেছি আমি থামিব কি এইখানে
শেষহীন পিপাসা-অতৃপ্তি !
স্বর্গের পথ হতে নামিলে ধরার পানে
পাবো তো তোমার দেহ-দৃপ্তি ।
নাই বা হইল মোর যাত্রা পথের শেষ
কি লাভ হইবে লভি' তথ্যে,
কি হইবে জেনে যাহা না জেনেও চলে বেশ,—
কি হইবে শাশ্বত সত্যে ?
তার চেয়ে এইখানে লুব্ধ হতেছে মন
রচিবারে দু'জনার স্বর্গ
তোমাতে হারাক মোর হৃদয়ের স্পন্দন
শেষ হোক চলা উপসর্গ ।

একটু দাঁড়াও থামি' ভেবে দেখি এ কিসের ছলনা
বিদ্যুৎ-কশা ধায় বিদ্রূপ-শাণিত ও হাসিতে,
একটু দাঁড়াও—দাও ভাবিবার অবসর ললনা,—
প্রলয় টানিছে জোরে বেসুর বাজিছে মোর বাঁশীতে ।
বাহিরে রয়েছে প্রিয়া—ঘরে আছে স্ত্রীর হাতে পুষ্টি,
বাহিরে অসন্তোষ ঘরে বসে পোষা প্রাণ-তুষ্টি,

বাহির হইতে আসে ইঙ্গিত-আহ্বান-লিপিকা—
বাহিরে ডাকিছে মোরে ধরণীর ভরা জনারণ্য,
স্তিমিত জ্বলিছে ঘরে সন্ধ্যার নিস্তেজ দীপিকা
আর আছ তুমি বসে সাজায়ে তোমার দেহ পণ্য !

তোমার এ ছোট নীড়ে অশান্ত আমারে কি কুলাবে ?
দুরন্ত প্রাণ-ঝড়ে মুহূর্তে নিবে না কি উড়ায়ে !
ধ্বংসের হুতাশন কোন্ জাদুমন্ত্র দি' ভুলাবে,
লেলিহ রসনা দিবে স্নেহ-সুশীতল ছায়া পুড়ায়ে !
মহাশূন্যের বুকে ছুটি আমি উল্কা জ্বলন্ত
কক্ষচ্যুত আমি গতি আছে নাই মোর পন্থ,
বাহুল্য আছে মোর ক্ষতিপূরণের নাই ভাবনা
নিজেরে পুড়ায়ে দিয়ে নিজের মাঝারে লভি' শান্তি,
জানি আমি যারে চাই হয়তো তাহারে আমি পাব না—
আলেয়া-স্বপন হ'সে—নাচে সুদূরের হেমকান্তি !

—১৯৪৩

[কবিতাটি 'দ্বিধ' নামে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট —গ দ্রষ্টব্য।]

॥ দশ ॥

চেয়ে দেখো জেগে আছে রজনীর দু'চোখ বিনিদ্র
কার লাগি' জাগে দূর বনানীর সবুজ তারুণ্য ?
তোমার আমার মাঝে অমারজনীর মসীছিদ্র
আমি শূন্যের ফাঁকি তুমি ধরণীর মাটি পুণ্য।
মাথার উপরে জাগে খাঁখাঁ বালু আকাশের সাহারা
ক্ষীণ তারকার দীপে সাবধানী পথিকের পাহারা !
আকাশে চাঁদের চোখ ভোলা মহেশের ধ্যাননেত্র,
তোমার আমার ধ্যান দুস্তর ব্যবধান-ক্ষুণ্ণ।
তুমি এই ধরণীর উর্বর শ্যাম তপোক্ষেত্র,
আমি যে ঊষর খর ধূসর ধূমল মহাশূন্য।

জোনাকি-প্রদীপ-কাঁপা তারা-ঘন নামে অমাবস্যা
বাতাসের হা-হুতাশ কান্নায় উন্মনা রাত্রি,
সূর্যের নাড়ীছেঁড়া তুমি ধরা ফলফুলশস্যা,—
ধরণীর নাড়ীছেঁড়া শিশু সুদূরের অভিযাত্রী !
মাঝখানে কামনার মৃত শব শীত-অবশাঙ্গ,
দুই পারে দুই জন,—বিচ্ছেদ হবে না কি সাঙ্গ ?
কালো আঁখি ! অপাঙ্গ দৃষ্টি তো অন্তর-পশ্যা
আঁধারের ওড়নায় কেন ঢাকো মুখ প্রেমপাত্রী ?

ক্ষীণআয়ু দিবসের ছায়াটানা ধূসর সমস্যা-
সন্ধ্যায় নীহারিকা জীবনের স্বপ্ন-বিধাত্রী !

পুরাতন পরিচয় শিশু সূর্যের অয়নান্তে
বন্ধন-ছেঁড়া আলো ছুটে অবিরাম অবিশ্রান্ত
তুমি আমি রহিয়াছি জগতের দুই সীমাপ্রান্তে
তুমি সুশীতলছায়া-পান্থপাদপ,—আমি শ্রান্ত ।
অসীম সাগর ফোঁসে—দুই পারে গুমরায় কান্না
ফুলে ওঠা তরঙ্গ-ফেনে বিয়োগাশ্রুর পান্না ।
সমান্তরাল রেখা অসীমে কেবল পারে টানতে
অবিরাম চলা তার হয় না কখনো মিলনান্ত,
নীড়বাঁধা পাখী থাকে ধরণীর শ্যাম-স্নেহোপান্তে,—
মরূদ্যানের খোঁজে উড়ে চলে নীড়হারা পান্থ !

তোমার আমার মাঝে চলে চির পুরাতন দ্বন্দ্ব
আকাশ-মাটিতে আছে ছোঁওয়াছোঁয়ি মিলনের সন্ধি
আমি চঞ্চলপাখা—তুমি শ্যামা ধরার আনন্দ
আমরা দু'জন এক অচেতন প্রেমপাশে বন্দী ।
নাগালের বাইরে যা তারে চাওয়া দুর্বল ভিক্ষা,
নিষ্ফল সুদূরের কুণ্ঠিত প্রণয়সমীক্ষা !
চলতি গতির ভারে কাটে তাল—কাটে সুর ছন্দ,
দু'মুখো পথের টানে আছে ছল—আছে অভিসন্ধি ।
ভুল করে শোধরানো জীবনের দ্বার করি বন্ধ
আলেয়া-আলোর ছল আগুনের আশ্বাসগন্ধী !

বহুযুগ পূর্বের পরিচয় আঁকা তব চক্ষে
দু'চোখ আকাশে মেলা কৌতুক স্মিত আস্য,
বিচিত্র বিশ্বের প্রতিভাস ছবি রূপদক্ষে
প্রেমিকা জননী জায়া—বৎসলা, সৌখ্য ও দাস্য।
সুখ দুঃখের ঢেউ আমি জাগি হিংস্র ও বন্য
আদিম পুরুষ গিরিদুর্গম সাগব অরণ্য
আমি অফুরাণ জ্বালা সহস্র সূর্যের বক্ষে,—
তুমি উচ্ছল খুশি চাঁদেব তরল কলহাস্য,
আমি ধূমকেতু জ্বলি বিদ্যুতে উল্কার পক্ষে,
ধরণীর লাবণ্য—তুমি সৃষ্টির মহাভাষ্য!

উদাসিনী ধরণীব তীর্থে তোমার পরিব্রজ্যা—
সন্ন্যাসী আমি খুঁজি আকাশে আমার পরমার্থ,
মাঝখানে নিষুপ্তি-আঁধারের অন্তিম শয্যা
দিতেছে মরণটান যবনিকা অপসরণার্থ।
তোমার আমার মাঝে প্রত্যাশা-আলো-লাগা সন্তোষ
গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায়—বৃথা কাঁদা, মিছে করা আফ্‌সোস!
দৃষ্টি আকাশে কচি সবুজের চিক্কণ সজ্জা
পশ্চাতে ফেলে আসা প্রান্তর আজ বেদনার্ত,
হারাণো দিনের স্মৃতি অসত্য প্রকাশের লজ্জা
স্বল্পায়ু জীবনের সায়াহ্ন খতিয়ান স্বার্থ!

আসঙ্গ অনুরাগ হতে কেন যাচা চিরমুক্তি,
রহস্য মায়াজাল—পায়নি তাহারো কেউ অন্ত,
জীবনের চঞ্চল স্রোতে আলো আঁধারির পুনরুক্তি—
তুমি তো দু'হাত ভরে দিয়েছো আলোক অফুরন্ত।

ঊর্ধ্বে বাড়ানো হাত—উন্মুখ যাত্রা অতন্দ্র—
ধর্মের হাতছানি—ঈশ্বর—স্পুটনিক—চন্দ্র—
বলিতে পারো কি এর পিছে আছে কোন মহাযুক্তি
ভাগ্য বিড়ম্বনা—দিনরাত খুঁজে মরা পন্থ !
দুর্গম যাত্রার সপ্ত সাগর সেঁচা শুক্তি
বক্ষের মণিকোঠা অগ্নি-দাহনে প্রাণবন্ত !

জীবন-জোয়ারে ভাটা যদি আসে ধরণীর কন্যা
মুহূর্তে বড় হয়ে দেখা দেয় যতো ভুলভ্রান্তি,
নির্জন নাচঘরে বিজলি আলোর রূপপণ্যা
সুনীল ঘোমটা পরা মৃত্যু আঁধারে লভে ক্রান্তি !
মুঠো মুঠো ছাই-ওড়া বাতাসে বিলীন শেষচিহ্ন
নেপথ্য জীবনের সাক্ষী রবে না তুমি ভিন্ন !
হবে পুড়ে নিঃশেষ উদ্দাম এই প্রাণবন্যা !
ছুটে চলা উল্কার অগ্নিদাহন উপশান্তি।
সে দিনও এমনি রবে শ্যামা সেরা সুন্দরী গণ্যা।
সবুজাভা ধরণীর লাবণ্যমাখা দেহকান্তি।

সে দিনও বাসিবে ভালো নব কবি বাণী তেজোগর্ভে,
সে দিনও পুড়িবে হবি-প্রাণাহুতি ভালোবাসা মন্ত্র,
সে দিনও বসিবে মেলা জীবনের সমারোহ পর্বে
সে দিনও রহিবে তব প্রজাদল—তব রাজতন্ত্র।
নিঃশেষে মুছে যাবে যে গেল তাহার নামগন্ধ,
মিশে যাবে টানা স্রোতে আজিকার যতো ভালোমন্দ।

আজিকার মতো তুমি সে দিনও দাঁড়ায়ে রবে গর্বে—
সে দিনও কাটাবে জেগে রজনীর দু'চোখ অতন্দ্র,
বারো মাস ছয় ঋতু তব পায়ে মাথা কুটে মরবে,
মিলনের মাঝে রবে দুইজন সে দিনও স্বতন্ত্র।

—১৯৬১

পথের গান

দ্বিতীয় পর্য্যায়

সালতামামি

দগ্ধ দুপুর ফেলিছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
ঝরে আগুনের হল্‌কা ক্রুদ্ধ বহ্নিচোখ,
দূরের বাতাসে ভেসে আসে শত হাহা-হুতাশ
কম্পন দাগ ভরে তোলে দূর উর্ধ্বলোক!
বর্ষশেষের খতিয়ান মোরে টানিতে দাও
লাভ আর ক্ষতি ঝুলায়ে কালের বাটখারায়,
বর্ষের শেষ সূর্য পেছনে ফিরে তাকাও
কাল-সমুদ্রে ডোবা বছরের স্মৃতি হারায়!
জমা গ্লানিভার, ক্লান্ত দিন আর অন্ধ যামী
পার হয়ে এসে টানি বছরের সালতামামি।

পার হয়ে এসে জরতী ধরার উদাস চোখ
ঝাঁজরা জীর্ণ পাঁজরা শরীর মাংসহীন,
পার হয়ে মরা মানুষের পচা বিশ্বলোক—
পার হয়ে রাহুগ্রস্ত আঁধার হাজার দিন!
মুখ ভেংচানো ছায়ামানুষের হিংস্র দাঁত,
তীক্ষ্ণ নখর-থাবা—আড়ষ্ট শীতল ভয়—
লোভ-চিকচিক চোখে ক্ষুধাতুর দৃষ্টিপাত-
রিরংসা আর রাশি রাশি ঘুম করি' বিজয়

'কল্পশেষের পুণ্য গঙ্গাধারায় নামি'
টানি খতিয়ান মহাপতনের—সালতামামি !

সময় হলো কি আজি নোঙর তুলে নেবার ?
সারাদেশে বিষগন্ধী বাষ্প—পতিতালয় !
কলঙ্ক ভরা যুগ-সমুদ্র পাড়ি দেবার
এসেছে কি আজ যাত্রী-জাহাজে শুভ সময় ?
রাবণের ঘরে সীতা কেঁদে যদি মুক্তি চায়
রামের অলস দিনযাপনের সময় কই ?
মন্দারে মথে যে-জন সাগর লক্ষ্মী পায়—
লক্ষ্মীরে কেহ পায় না পুরুষসিংহ বই !
সুধা বা গরল যা উঠে উঠুক কি যায় আসে,
নীলকণ্ঠের কি করিবে বলো গরল গ্রাসে ?

আমরা হেরেছি তাই তো খেয়েছি সবার মার,
তাই আমাদের পুথিপাঁজি আজ হলো অচল ।
বঞ্চনা ভরা একশো বছর হয়েছি পার—
আমরা হেরেছি হারায়ে মোদের মনের বল ।
না-বুঝে না-শুনে পরের মুখেতে খেয়েছি ঝাল,
পরের কথায় উঠেছি বসেছি ফেলেছি পাও—
ঠকেছি অনেক করিয়া নকল পরের চাল
নিজের সত্যে কিনেছি পরের মুড়তাটাও !
কত দিন গেল—বছরের পর বছর শেষে
জাগে দুই আঁখি পরমুখ চেয়ে নির্নিমেষে ।

সত্য মোদের ভাবুকতা আর ভাববিলাস,
তাই তো খেয়েছি অতিহিসেবীর হাতের মার।
বেহিসেবী জাত! পরেছে গলায় কথার ফাঁস,
পাটোয়ারদের দিয়েছে ছাড়িয়া সদর দ্বার।
শুধু কি সদর? আবরু রাখে নি এক ফোঁটাও,
লজ্জা-সরম মান-সম্ভ্রম উজাড় সব!
পরের দুয়ারে হাত পেতে ডেকে—ভিক্ষা দাও—
অন্যের দেওয়া পণ্যে করেছে মহোৎসব!
নিজ কথা ভুলি কপচে মরেছে পরের বুলি,
সোনা দিয়ে কেনা হয়েছে দু-মুঠো অসার ধূলি!

•

ছায়া-কাঁপা জল বয়ে চলে—কলকাকলি বয়,
সূর্য ছড়ায় পিচ্‌কারি মেরে আলোর ফাগ!
স্বর্গের শিশু আলো গলে চোখে কি বিস্ময়
চুমে ধরণীর সবুজে সবুজ শ্যাম সোহাগ!
রুদ্ধ দুয়ারে আলোয় আলোয় আলোর হানে আঘাত
খসে বুকে চেপে বসা শাসনের কালো আসন।
ফুঁসে যৌবন-জোয়ারে জীবন অকস্মাৎ,
তাজা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে সারা দেহ ও মন।
নব বছরের প্রভাত শিয়রে দাঁড়ায়ে আমি
টানি জের—টানি শত বছরের সাল্‌তামামি

নূতন সূর্য নব বছরের নব প্রভাত
অতীত আত্ম-অপমান আর গ্লানি ঘুচাও,
পার হয়ে এসে দুঃখ-দীর্ঘ-তিমির রাত
আলোকের শুভ আনন্দে আঁখিজল মুছাও!

জীবনের পথে বার বার যত খেয়েছি মার
সুদাসলে সেই ঋণ আজ যেন শুধিতে পাই,
জীবনের পথে বার বার যত হয়েছে হার
অট্টহাসিতে তীব্র সে জ্বালা ভুলিতে চাই !
হলুদ সকাল রেশমী আলোর ঢাকনি বোনা,
স্বপ্ন-উজ্জল সমুখে ছড়ানো আশার সোনা ।

আলেখ্য দর্শন

রামরাজ্য তো ত্রেতাযুগে ছিল ! উত্তর রামরাজ্যে থাকি,
পুণ্যের জোরে বাঁচি—বায়ুভুক্ পরমায়ু দ্রুত বেড়েই চলে,
পাকা হিসেবের খাতায় এ লেখে—নাই গাঁজাখুরি ফাঁক না ফাঁকি
রাম ভক্তেরা বাঁদর এ কথা রামায়ণ আর শাস্ত্রে বলে !

রামরাজ্যে কি রাবণ থাকে না—থাকে না সোনার লঙ্কাপুরী ?
কালনেমিরা তা ভাগ করে খায় পুরাণে একথা লেখাই আছে !
চোরও থাকে—কথা একই ভেবে দেখো সীতা চুরি আর পুকুর চুরি
জীবনের মান উঁচু হয় কাল—কালোবাজারের কল্পগাছে।

কুচক্র-কূট দুরভিসন্ধি—কোথা পথ কোথা আশার আলো ?
মুখফুটে যদি বুকের ভাষায় জিজ্ঞাসা করো আমারে তুমি,
উত্তর এর জানা নেই স্রেফ এ কথা স্বীকার করাই ভালো
কুচক্রী তার চক্রে পিষিছে বিশ্বভুবন ভারতভূমি !

গদি আর গলি দুই স্বর্গের ভণ্ডামি আর নোংরামিতে
পাকা খেলোয়াড় রুই কাতলায় ধরে—তুমি আমি চিংড়িপুঁটি !
নপুংসকেরা তেল ঢালে পায়ে আপন আখের গুছিয়ে নিতে—
আমাদের গ্রাস কেড়ে-খাওয়া-ভুঁড়ি বেড়ে চেপে ধরে মোদের টুঁটি !

ভাবিষ্যতের মুখে চেয়ে ভোলো আজকার যতো ভয়-ভাবনা।
রামরাজ্যের বুলি কপচিয়ে বাঁচিবার দায় এড়িয়ে চলা,
কাঁচা উপদেশ মেনে চলো—ছাড়ো খাই-খাই ক্ষেতে ফলিবে সোনা,
ভবিষ্যতের বুজরুকি দিক বর্তমানের রক্তে দোলা।

আরাম স্বপ্ন দিয়ো নাকো ভেঙে, ভাত দাও বলে বায়না ধরো!
ভালো কথা নয়, বড়ই খারাপ! কাঙালপনা এ ঘুচিবে না কি?
এই ক'বছরে আর কতো চাও! কিছুদিন আরো সবুর করো!
পরিকল্পনা মিছে নয়—রামরাজ্যের আর থোড়াই বাকি!

বেকুবের হাতে সোনা হয় লোহা—অচেতন ঘুম মরণ কাঠি।
রাজকন্যার ঘুম-ভাঙানো জীয়ন কাঠির পরশ সোনা
ক্লীবের হাতে যে দেয় না ধরা এ নিছক সত্য নিকষ-খাঁটি
দুঃসাহসীর কাজ ভাই রাজকন্যারে আজ ছিনিয়ে আনা।

নতুন দিনেরা এখনো সুদূর—পাপকলি শেষ প্রহর যাপে,
রামরাজ্যের হদিশ না জেনে বুলি কপচানো শোনায় ভালো।
ছায়া-লম্বিত সন্ধ্যা মায়ায় পুরাতন বুড়ো দিনেরা কাঁপে
দিগ্বলয়ের সীমায় আঁধার নিকষ-পাষাণ-কঠিন-কালো।

সামনে শঙ্কা কুটিল রজনী ম্লান মুছেযাওয়া পথের দিশা,
কৃমিকিলবিল মানুষ ভুলেছে প্রথম যাত্রাদিনের কথা।
শেষ সন্ধ্যার নিকষিত হেম-হলুদ-আলোর কণায় মিশা
ঝলমল আশা ধ্রুবতারকায় অধীর অন্বেষণের ব্যথা।

ঘুমে অচেতন তরঙ্গফণ-সমুদ্র শেষ-শয়ন পাতা
বিষ্ণুর ঘুম ভাঙিবে অযুত আঁধার যুগের তপস্যাতে,
সম্ভাবনার আলোক এখনো আঁধার গগনে কুটিছে মাথা
ভীরু বুকজোড়া নিরুপায় আশা নিদ নাই তুই আঁখির পাতে !

রজনীর কালো মুখ মিলাইবে কাকলি-আলোয় একথা জানি,
দুঃখদিনেরো শেষ আছে এ যে প্রকাণ্ড এক আশার কথা,
রাত্রির পর দিন আসে এরে চির দিবসের সত্য মানি—
মহামৃত্যুর পরে আসিবে তো মহাজীবনের উচ্ছলতা !

স্মরণ

নরম মাটির বুকে ঢলে পড়া গন্ধমধুর সুর
শতাব্দীপারে নাড়া দেয় ছোট বাতায়ন—কারাগার,
বিস্মৃতি-কালো ম্লান কুয়াসায় চারদিক ভরপুর
খরতাপে গলে ঝরে পড়ে, মোবা সাড়া দিই বারবার !
আমরা পাইনি উদার আকাশ মেঘে জরি-টানা পাড়—
পাইনি আমরা ধ্রুবতারকার দিশারী মশাল লাল,
একফালি ছোট আকাশের নীলে টানি জীবনের দাঁড়
অক্ষম কথা গেঁথে রচি ফাঁপা ফানুসের মায়াজাল !
আমাদের ভাল অবিরাম চলা ঘাটে ঘাটে তরী বাঁধা—
আমাদের ভাল অপরের সুরে আপনার গলা সাধা।

ক্ষীণ দৃষ্টির পুরু কাঁচ পরা পশ্চিমে হেলা দিন
গোধূলি আলোয় হাতড়িয়ে ফিরে দিশেহারা মনোরথ,
কক্ষচ্যুত হাজার তারার আকৃতি অবধিহীন
অন্য গ্রহের চাঁদের আলোয় খুঁজে নিজ গতিপথ।
বহ্নিবলয় সন্ধ্যাসূর্য-তাপে পিপাসার বান
অতিথিবাণীর পূজামন্দির দুই চোখ ঝলসায়,
গ্রহান্তরের হৃৎস্পন্দন শুনি পাতি' দুই কান,
অন্য লোকের কথা কই—সারি আরেক ধরার দায় !
ধ্রুবতারা যদি ডুবে গিয়ে থাকে মিছে তারে খুঁজে মরা,
নিবু নিবু যদি প্রদীপের আলো বৃথা তার হাত ধরা !

পাইনি তোমার জীবন-খেয়ান, স্বপ্নজাগর-চোখ,
তোমার স্বপ্ন আমরা দেখেছি নাগালের সীমানায়।
ভিন্ন জগৎ-বৃত্তকক্ষে মোদের স্বর্গলোক
আহ্নিক আর বার্ষিক পথে চিরদিন আসে যায়।
তোমার বিজয়ে আঁকা আছে কবি আমাদের পরাজয়,
জীবন-পণ্যে আমরা ভেজাল বেসাতির বাজিকর!
জানি আমরাও আমাদের এই অক্ষম পরিচয়—
ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে মরি আমরা জীবনভর!
আমাদের ছোট ধ্যানে সাধনায় সত্য যেটুকু আছে
যুগ-জীবনের উদয়-প্রভাতে সে সত্য যেন বাঁচে।

দিগ্বিজয়ীর বিজয়মুকুট আলো পড়ে ঝলমল
আলো ঠিকরনো হীরামুক্তায় পদ্মরাগের লাল,
দেশবিদেশের গুণিজন আর বাণীর পূজারী দল
শতবার্ষিকী যজ্ঞের ভেট ভরে তোলে থাল থাল।
চমকে তাকাই, জগৎ দিতেছে বাণীসাধনার দাম—
সোনার কাঠির স্পর্শ লেগেছে জগতের চেতনায়.
বিশ্বের প্রাণ-কেন্দ্রে যে কথা বয়ে চলে অবিরাম
সাড়া তার লাগে বিশ্বভুবনে—তাহারে কি ভোলা যায়?
কবির ধ্যানের পরশ অথবা গানের পরশ লাগি'
বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে দেখি বিশ্ব উঠেছে জাগি'!

[বৈশাখ ১৩৬৭, শনিবারের চিঠি 'রবীন্দ্র-সংখ্যা'য় প্রকাশিত। বিশেষ কারণে কবিতাটি শেষ না করেই ছাপতে দিই। আর তারি জন্যে কবিতাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।]

অন্তিম প্রতীক্ষা

অন্তিম প্রতীক্ষা !   দূরে লাল সুদিনের প্রাণাভাস,
আলো-সন্ধানী চোখ চায় ধরণীর মুখে অপলক,
চমক-চেতনা ঘায় স্তব্ধ নিথর কালো মহাকাশ
কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রির মৃতদেহ মেলে চোখ।
দপদপ শুকতারা একা মাঝ-গগনের খেয়াপার,
হাতছানি দেখা যায় ক্ষীণ আলো দুস্তর পন্থার,
দু'চোখে জড়ানো ঘুম বাতাস গণিছে দিন—কতো দূর!
অজানা পথের টানে আকাশের দুরু দুরু কাঁপে বুক,
তিমির ঘোমটা টানি রাত জাগে প্রতীক্ষা-ব্যথাতুর
নূতন দিনের লাগি' রজনীর তারা-আঁখি উৎসুক।

বুড়ো মহাকাল বসে ধ্যানে—নিমীলিত আঁখি যোগাসন,
সুদিনের তপস্যা ! মেঘ জটাজাল কাঁপে আলোছায়,
জরাজর্জর দিন ভয়াতুর—মরা রাত ভীত মন
মরণ কামড় হানে ধরণীর জংধরা পাঁজরায়।
ছাইঢাকা আগুনের বিদ্যুৎমাখা ঘন কালো মেঘ
গুমরানো কিনারায় রক্তিম চোখ ফোঁসে গতিবেগ !
দুরন্ত প্রাণঝড় দুর্দম যৌবন-ঝঙ্কার
ধরণী ও জীবনের ভাগ্যের ইঙ্গিত ইতিহাস,
মাথা খুঁড়ে কচি আলো—শ্বাসরোধী কংসের কারাগার—
বাসী যুগ সীমান্তে রুদ্ধ দুয়ার আশা-আশ্বাস !

সাবধান—নিশাচর আঁধারের শিকারীরা সাবধান!
দু'হাতে মজা লোটার আছে এক নিষ্ঠুর পরিণাম,
চিরদিন সহিবে না মানুষের সহিষ্ণু ভগবান্
বিপ্লব কোলাহল প্রভাতের—রজনীর শেষ যাম!
দু'চোখে স্বপ্ন ঘুম—বিচারের দিন গণে মহাকাল,
উৎকট পাপ হলে শোধ নেয় কবরের কংকাল!
আনন্দ প্রভাতের সুখ-জোয়ারের প্রাণ-বন্যায়
প্রলয়ের শঙ্কা-দোলানো-ঝড় করে দূর জঞ্জাল,
রক্তে হইবে শোধ আজিকার অভিচার-অন্যায়
সাবধান! ভুলিবে না কণা এর ক্ষমাহীন ভগবান।

ধ্রুবতারার ক্রন্দন

॥ ১ ॥

দূরান্তে চাহিয়া দেখ, শ্যামশষ্পে ভ্রূকুটি ভয়াল.
সমুদ্রের নোনা জলে লবণাক্ত দেহের রুধির,
আকাশ উচ্ছ্বাসহীন,—নত দৃষ্টি অবনত শির
পৃথিবীর পাঁজরায় কাঁপে ছায়া মৃতের কঙ্কাল !

ধূমল দিগন্তে হারা ধরার হরিৎ স্বপ্নজাল,
ক্ষুৎপিপাসার দাহ তীব্রতর, মাগি অন্ননীর।
সুজলা সুফলা গঙ্গা পদ্মা আর যমুনার তীর,
বিদ্রূপের অট্টহাসে ফেটে পড়ে আকাশ মাতাল।

বন্ধু ওগো, বলিবে কি কত দূরে এ পথের শেষ,
হবে অবসান এই মরীচি-মায়ার দুঃস্বপন ?
কোথা তীর বন্ধু, আঁধি-নৃত্যে লুপ্ত দিক্‌চিহ্নলেশ,
বায়ু মাঝে গুমরিয়া ফিরে ধ্রুবতারার ক্রন্দন !
বিভ্রান্তি-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ অন্ধকারে চাহি নির্নিমেষ
ঝিমায় দু'চোখ বোজা জরাগ্রস্ত যযাতি-যৌবন।

॥ ২ ॥

আরও দূরে চাহ বন্ধু, তিমিরাবগুণ্ঠিত রাত
অবসন্ন দিবসের ছায়াতলে আসন্ন মৃত্যুর !
ন্যুইয়র্ক মস্কো প্যারী লণ্ডনেরও রক্ত ভয়াতুর,
সুদূর ভবিষ্য মাঝে সুপ্তিলীন প্রসন্ন-প্রভাত !

অন্ন নাই—বস্ত্র নাই—ভিক্ষাপাত্র কলঙ্কিত হাত,
বলিতে পার কি বন্ধু, তার শেষ আরও কত দূর !
এমন বাঁচার চেয়ে মৃত্যু সে যে মধুর—মধুর !
মাথা কুটে মরে আলো অন্ধকারে হানি করাঘাত।

বলিতে পার কি বন্ধু, এমন কাটিবে কতদিন,
হিরণ্যকশিপু-কারা হতে মুক্তি পাবে না প্রহ্লাদ ?
রক্তমূল্য বিনিময়ে হবে শোধা যৌবনের ঋণ ?
রক্তমূল্যে হবে জয় তিমিররাত্রির অবসাদ ?
কতদূরে সুপ্রভাত ? দীর্ঘরাত্রি আশা-আলোহীন।
কান পেতে শোন বন্ধু, ব্যর্থ যৌবনের আর্তনাদ !

একটি মানুষ নাই

॥ ১ ॥

দিনের প্রান্তর রচে রাতের গভীর যবনিকা
ঘন ঝিল্লিস্বরে কাঁপে দিগন্তের ছায়া-ঘেরা মাঠ,
ভাবি আজিকার কথা কালান্তরে হবে বুঝি লিখা,
বিকার-বিক্ষিপ্ত চিত্তে শোনাই জীবন-গীতা-পাঠ।
কুটিল রাত্রির শেষে প্রভাতের রক্ত অগ্নিশিখা
চিতাভস্মে মিশাইবে ইতিহাস-কলঙ্কিত-নাট!

আজিকার ইতিহাসে আঁধারে পাপের পথ চলা
অসুস্থ মানুষ মরে মানুষ-পশুর অত্যাচারে,
অন্নহীন বন্যাবিষদিগ্ধ বাংলা সুজলা সুফলা
ছিল কবে ভুলে গেছি মানুষের ক্ষুধা-হাহাকারে!
ইতিহাস করে ব্যঙ্গ—ক্ষুধা-কালো তৃষাশুষ্ক-গলা
আধমরা মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র কামনারে!

মানুষকে দিতে হবে অমানুষ মূঢ়তার দাম,
অনাগত দিবসের পদতলে সন্ধ্যার প্রণাম!

॥ ২ ॥

পাটল দিগন্তে সন্ধ্যা—প্রভাতের আভাস সুদূর,
বিষদন্ধী রুদ্ধ বায়ু ফোঁসে রোষে ভ্রূকুটি-কুটিল।
কানাকানি ফিস ফিস চারিদিকে—চোখ ক্ষুধাতুর
নীল মৃত্যুদূত ঘুরে—নরমাংস-ভোজী কাক চিল
ঊর্ধ্বে ওত পেতে বসে ; নিম্নে ছায়া-কঙ্কাল মৃত্যুর!
সোনার বাংলা কে বলে ? দগ্ধ স্বর্ণলঙ্কা হালফিল!

পতন তো নয়, এ যে পতিত জাতির ইতিহাস—
ভাগাড়ে আবদ্ধ দৃষ্টি জানোয়ার চোর ঘুষখোর!
একটি মানুষ নাই,—দুপেয়ে পশুরা বার মাস
একটানা পূতিগন্ধ প্রবৃত্তির মদেতে বেঘোর!
সোনার বাংলা এ নয়, শ্মশানে প্রেতের অট্টহাস,
মানব-পশুর নগ্ন নৃত্য চলে পথে ঘাটে জোর।

কোথা সব্যসাচী ? দেখি চারিদিকে ক্লীব বৃহন্নলা।
একটি মানুষ নাই শিরদাঁড়া খাড়া-করে-চলা!

বেমিল

আকাশের খুশি আসিতো নামিয়া ধরার গায়,
ধরণী পাঠাতো আকাশে সুরের আলিঙ্গন,
নেমে-আসা আলো দিতো চুমা স্নেহশ্যামলিমায়
বিহ্বল ধরা—উন্মুখ সারা দেহ ও মন !

আলোর কাকুতি শুভ্রধারায় পাঠাতো দূত
কামনার পথে আনাগোনা করা চরণ তার,
স্বপ্ন-চোয়ানো সে জীবন ছিল কি অদ্ভুত !
পাঠিয়েছিলাম সেই আলোকেরে নমস্কার !

বহু নরনারী চলেছিল দিক্-ঠিকানাহীন
আলো আঁধারিব পথ বেয়ে দূব সুদুর্গম
তরল ছায়ার কম্পনদাগ দূরে বিলীন
তীব্র তিয়াসে মায়ামরীচির সলিল ভ্রম।

কোথা সে জগৎ যাহার লাগিয়া জীবনমান
চলা অবিরাম, আলো-সন্ধানী মানুষ কই ?
চারদিকে এক আঁধার জীবন ভ্রাম্যমাণ
সেই আঁধারের কিনারে নিজেও শরণ লই।

বিকৃতরুচি বন্ধ্যা জীবন অসুন্দর,
বুকে হেঁটে চলে ছায়ামানুষের সরীসৃপ—
শীত-পিচ্ছিল কুৎসিত কালো রাত্রিচর!
আঁখি একটানা—রজনী নেভানো তারার দীপ!

বহুরূপী মন ভাবনার স্রোতে করে আবিল
দৃষ্টি হারায় শুভ্র জ্যোতির ধ্রুবতারায়,
মাটি ও আকাশে হয় না কখনো মনের মিল,
মাটির ফসল শূন্যে ফলে না কখনো হায়!

রূপালী জ্যোৎস্না ঝরতো যে কবে ধরার গায়
ভুলে গেছি আজ—হলুদ সোনার সকাল ভুল!
সোনা মিছে,—মেকি ফাঁকিনিকেলের রূপাগাকায়
বাঁধা জীবনের আঁধারে ফুটে না আলোর ফুল।

পঙ্গু জীবন সন্ধ্যা আঁধার-ঘোমটা-টানা
মানুষ পশুতে তফাৎ কোথায় বোঝা কঠিন।
সামনে দীর্ঘ অমারজনীর কবরখানা
তার পরপারে সুপ্তিমগ্ন আলোর দিন।

নিরুপায় ক্লীব মানুষের আজো চলে মিছিল
দুর্গম পথে যাত্রার তবু হয়নি শেষ?
মাটি ও আকাশে জানি হতে পারে মনের মিল
মাটির ফসলে যদি ভরে উঠে আকাশ দেশ।

কোথায় দিশারি

দাঁড়ায়ে রয়েছি দূরে ছেড়ে দেওয়া দৃষ্টিতল
শ্রান্ত দিনের অবসাদরাশি আকাশ ছোঁয়,
পঙ্গু জীবন ধুঁকে-ধুঁকে চলা ভয়-শীতল
ঘোলাটে দু'চোখে জমাট আঁধার—জমাট ভয় !
মানুষ চলেছে পথের ঠিকানা হারিয়ে যাওয়া,
দূরের বাতাসে আসে সুর ভেসে কান্নাপাওয়া ।

কালো আকাশের কোণ মাথা উঁচু খণ্ড মেঘ,
শঙ্কাকাতর তামাটে রাতের তারার চোখ,
থমথমে হাওয়া গুমোট-রুদ্ধ বিপুল বেগ,
ছমছম ভয়শিহরণ লাগা শূন্যলোক ।
দূরের বাতাসে ভাসা সুর কাঁপে পুনঃপুনঃ
গান নয়—ওই কান্নার ঢেউ আসিছে শোনো

লাল আগুনের শিখা লকলক কৃষ্ণধূম
ঘর পুড়ে ছড় টানে নীরো তার বেহালাটায়,
বর্বর নরপশু-চলা ভীরু রাত নিঝুম
প্রেতের তা-থৈ নৃত্য জগৎ চিতাশালায় !
ভূয়া আদর্শে দল গড়ে তোলা ধাপ্পাবাজি
রাজনীতি ক'রে স্বার্থ গুছায় কাজের কাজী !

কোথায় চলেছি—কোথা পথ ? কোথা দিশারি—কই ?
কোথায় জীবন,—যুগজীবনের কলোচ্ছ্বাস ?
আঁধারের বুকে সন্ধানী চোখ তাকিয়ে রই
বিশ্ব যেথায় সম্ভাবনায় রুদ্ধশ্বাস।
কতো দূরে আছে আরেক যুগের প্রভাত-রেখা
অন্ধদৃষ্টি রয়েছি এপারে দাঁড়ায়ে একা !

হিংস্র মানুষ মানুষের হাড় চিবিয়ে খায়,
মানুষে পশুতে ভেদ কোথা বোঝা কঠিন কাজ,
দোরের আগল খোলে না অসার কথার ঘায়
শান্তির বুলি শুনে হাসি পায়—ফাঁকা আওয়াজ !
কাঁপে মহাকাল জীবন নেমেছে দু'খানি পায়ে,
নাচে নটরাজ—নূপুর বাজায়ে ডাইনে বাঁয়ে।

হালখাতা

অশোক পলাশ আর শিমুল ফুটেছে শেষ-ফাগুনে
চৈত্রের কাঠ-ফাটা ক্লান্ত মাঠের চোখ অনিমেষ
বৈশাখী জ্বালা লাল শিরীষে কৃষ্ণচূড়ায় আগুনে
সূর্য প্রদক্ষিণ হয়েছে তো এবারের মতো শেষ।
মাটিচাপা পুরাতন মরে যাওয়া বছরের কবরে
দুঃস্বপনের মতো কাটে যদি কভু তার কালঘুম ?
মিথ্যা এ! যা মরেছে কাজ কি তাহার খোঁজখবরে
চিরনিদ্রায় তাহা ঘুমাক অবশ আঁখি নিঝঝুম!
অনাগত দিবসের কল্পনা—অতীতের ক্রন্দন
তার চেয়ে এই ভালো গাহি নতুনের অভিনন্দন।

হিসাব-নিকাশ শেষ—সুবর্ণ আলোকের জোয়ারে
সূর্যের সাতঘোড়া সহস্র রশ্মির বল্‌গায়
রাশি রাশি যৌবন উঁকি মারে প্রভাতের দুয়ারে
লুটে পড়ে উন্মুখ গতিভারে মানুষের পায় পায়।
আফসোস করা মিছে, গেছে যা মিশায়ে যাক অতীতে,
পেছন পেছনে থাক—সামনে তাকাও মেলে দুই চোখ,
ভবিষ্যতের টানে জগৎ চলিছে দ্রুতগতিতে
তার সাথে পা মিলিয়ে ভোলা ভালো গত পরিতাপ-শোক।
অভাব ও অভিযোগ—জের টানা ভালো নয় ভালো নয়,
কচিপাতা আনিয়াছে নূতন বছর গাও তারি জয়!

বাসন্তী শাড়ী পরা ধরণীর পুষ্পিত পুলকে
ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন উঠুক ঝলি' আর বার,
আহুত উৎসবে আরণ্য অবসরগুলোকে
ভরে তোলে ভোলা ভালো কুণ্ঠিত জীবনের হাহাকার।
একের লোভের দাম শোধ হয় অপরের শোণিতে—
সীতা হরে দশানন নিষ্পাপ জলধির বন্ধন।
বেনিয়ম হলোই বা—বাধা কি নিয়ম বলে গণিতে,
ভাগ্যের মার রচে 'স্বস্তি' ও 'শান্তি'র নন্দন!
সত্যের জয় নয়, এ ছকে দাবার চাল সুকঠিন,
অযোগ্য মরিবেই—সত্য যুগের শেষ বহুদিন!

চৈতালী নিঃশ্বাসে বিশীর্ণ ঝরাপাতা ঝরবেই,
যেতে দাও যতো সব পুরাতন অভিলাষ রঙহীন,
সিন্দুর লাঞ্ছিত হিসাবের হালখাতা ভরবেই,
সূর্য ও ধরণীর চক্রে ঘুরিবে তাজা রাতদিন।
নব অভিযাত্রার অগ্নিতে পুরাতন পুড়বে,
সংঘাতে হবে শেষ গ্লানি আর অভিশাপ অভিনয়।
অন্যায়-অন্ধেরা মৃত্যুর পায়ে মাথা খুঁড়বে
দম্ভ কোলাহলে ঢাকা ভীরু দুর্বল পরিচয়।
শব সাধনায় মিলে মুক্তির আনন্দ শতদল,
সোনালী সকাল কাঁপে—উদয়ের আলো-আঁখি বিহ্বল!

পরিশিষ্ট—ক

[কবিবন্ধু সজনীকান্ত দাসের জন্মদিনে লেখা দুটি কবিতা]

॥ ১ ॥

পুষ্পমাল্য চন্দন ধূপ গন্ধ-সার
ষট্‌পঞ্চাশ জন্মদিনের মহোৎসব—
হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে রচি মোর এ উপহার
গাঁথি কবিতার মালা দিয়ে মোর বাণী-বিভব,
দিবে অনেকেই ভারি উপহার দাম কষে
ভাবগম্ভীর ছন্দের মালা পরাবে কে ?

তাই আমি দিই উপহার মোর ভারবিহীন,
দাম কষে যার হয় না বিচার—বুকচিরে
রক্তে জমানো পদ্মরাগের আভাবিলীন
দূর হতে ধরে আনা রক্তিম দ্যুতিটিরে।
গোপন আমার সুর-সাধনায় জীবনমান
পেয়েছি যে ধন তাই আমি করি তোমারে দান।

প্রভাত কখন শেষ হয়ে গেছে—দুপুর শেষ—
অপরাহ্নের ছায়ায় কাঁপিছে বনের ধার,

সন্ধ্যার শুকতারা চোখে চায় নির্নিমেষ
জাগে জিজ্ঞাসা—দৃষ্টি ধূসর অন্ধকার।
জীবনেরে যেথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় মানুষ—তার
অন্ত কোথায় অন্তবিহীন জিজ্ঞাসার ?

জিজ্ঞাসা জাগে—ষট্পঞ্চাশ জন্মদিন ?
সত্যি কি তাই ? প্রথম জন্মদিবস নয় ?
অন্তরে বসে আছে যে মানুষ অন্তহীন—
জাগে জিজ্ঞাসা—সত্যি কি তার বয়স হয় ?
কৃত্রিম ভানে ভরা বয়সের খোলস—তার
ভেতরে প্রথম জন্মদিনের শিশু আকার।

ষট্পঞ্চাশে প্রথমে মিলে যে জন্মদিন
সে বিশেষ দিন আসুক ফিরিয়া একশোবার,
গণ্ডিবদ্ধ জীবনে মানুষ গণ্ডিহীন—
জন্মদিনের বিশেষ মানুষ নিত্যকার!
পাগলামি না কি—নিত্যবস্তু কিছুই নয়—
বিশেষ দিনের বিশেষ মানুষ সত্যময়।

প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন,—জন্ম-লয়—
চিরশিশু এক বসে হাসে মুখ বিকারহীন,
অন্তর আর অনুভূতি জানে সে পরিচয়
বয়সের পরিচয়ে নয় এই জন্মদিন!
তাই প্রভাতের ছড়ানো আবির—পদ্মরাগ—
রক্তিম করে তোলে গোধূলির প্রান্তভাগ।

—৯ই ভাদ্র, ১৩৬২

॥ ২ ॥

জন্মক্ষণ প্রশস্তিঃ

সপ্তোত্তরপঞ্চগুণদশমিতাঃ সমাঃ সলীলং নয়ন্
অন্তস্বাস্তসুবিশদৈষণাভৃতাং বন্ধুজনানাং সতাং
প্রেমস্নেহসরসিতাৎ মৈত্রাদিগুণময়হ্রদাম্বুধেঃ
সমুত্থিতশ্চন্দ্রঃ খলু সুষমাভৃৎ চন্দ্রে পদং স্থাপয়ন্ ।

কোঽয়ং ! ভাতি ! সুষময়া সুবিশদাহ্লাদান্তরিতয়া
নিষ্পঙ্কঃ ! শকলকলাকলঙ্কী ! সম্পূর্ণোঽয়ং কলানিধিঃ
মর্ত্যঃ ! পরং, নিশাচরো দিনচরঃ বিদগ্ধহৃদ্‌সংচারী
ঋতু-দিক্‌গুণিত-বেদপরিমিতাঃ সকলকলাঃ কলয়ন্ ।

নান্যঃ ! খলু পুরোহিতঃ বঙ্গবাগীশ্বরাণাং
গুণাগুণেক্ষণচনঃ ন্যায়মার্গপ্রচারী
শনিবারে দোষভীরুঃ রবিবারে গুণজ্ঞঃ
মোদামোদং সমাদধন্ বাণীকান্তোঽয়মিন্দুঃ ।

প্রীতিপ্রেমসুধাপূরে সুখস্নিগ্ধে সহিমে
সুধীজন-সরসিজদল আশা সুশুভ্রে
সুমানসে 'সসজনী' রাজহংসঃ সুকান্তঃ
শতাধিকশরদাঞ্চ জীবতাৎ ! শিবমস্তু ॥

—৯ই ভাদ্র, ১৩৬৪

পরিশিষ্ট—খ

[কবিবন্ধু শ্রীকৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ও শ্রীশুভেন্দু ঘোষ এ বইয়ের প্রথম পর্যায়ের চতুর্থ সংখ্যক কবিতা "বিস্ময় ভরা ছু'চোখ মেলিয়া কতো কিছু দেখিলাম"-এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ ছু'টি এখানে দেওয়া গেল।]

I

THE SEEN AND THE UNSEEN

Things have I seen with these eyes,
Open wide with wonder.
My Earth, how can I name them ?
My insight has apprehended
The shapes of beauty outside their names.
In one corner of my heart lie hidden
Those unwinking eyes ;
Myriads of earthly brides
Have beckoned me and gone ;
I gaze on without a break,
No time to ask their names.
I'm afraid lest they elude me
Engaged in idle questioning,
And leave behind a void for me.
That's why I have never come
To make their aquaintance.

These wondering eyes
Have watched the universe (of life)
Well up and flood my void.
Liquified it runs like some
murmuring stream.
I've seen the fragrance of flowers
steam up into the skies.
I've seen the Palas* and Asoka* in flames
I've seen the forest burning,—
The bridal bed of my heart
I've seen with beauties crowded.
I've seen the glamour of thy body pure
In a moment swallowing up everything.
The lightning of thy eyes have flashed zigzag
across my heart
Revealing thy heart to it.
Everything has hinted at that—thy body.
Thy consciousness rolls in the dust
As I pass along the path,
I've seen everything with these eyes
Bnt alas ! thee I've never seen.

Translation by
Shubhendu Ghose

* Common flame-coloured Indian flower.

II

Listless, my eyes have seen things myriads.
Dear Earth, you ask me to name them ?
Under the lids
Colour and lines have blazed their trail
bereft of the synopsis of a name.
Ensconced in my heart lie the gazes
that seemed to know no stop—
Hundreds of these darlings of the Earth
have called and called
and looked and looked.
Where was the time to ask their credentials ?
The idle question might put them beyond

my perception
And what would have been thus lost
would have been lost for ever.
So unintroduced to each other I go my way
And the days speed to their end
following the trail of the unknown.
Listless—
The universe sweeps me along—
The river's a message in thaw,
The sky's seized with the smell of flowers,
The Asoka and the Palasa are in flames—
the entire wood's a burnt panorama
And the whole being rises in a hymnal
of this serried beauty.

I have seen the gleam of the graces
in an instant envelop the universe.
Like the streak of a lightning
These wide eyes of yours
have flashed through my being
and put me in possession
of messages galore.
The hint of thy existence
I've felt in the hints the universe
has so generously thrown.
The dust I tread make me aware
of thy being—
My eyes have seen and seen
But thee I've not seen—
That's what I bemoan.

Translation by
K. N. Roychowdhuri

পরিশিষ্ট—গ

কবিতার সুর

ত্রিবেণী নামক কবিতার বই প্রকাশের পর আমার অন্য কোন কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি। 'কবিতার সুর' নামে একটি প্রবন্ধ যতদূর মনে পড়ছে 'দৈনিক কৃষকে' প্রকাশিত হয়েছিল। সে বহু বৎসর আগের কথা, এতো দিন পরে তা' খুঁজে বের করা আজ আর সম্ভব নয়। তা' ছাড়া সেটি ছিল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। বেশী কথায়ও যে জিনিস বোঝানো যায় না অল্প কথায় সেটাই আবার বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। সে দিনের সে প্রবন্ধ পড়ে যেমন কারো কোন লাভ হয়নি, তেমনি আজকের এ ভূমিকা পড়েও কারো বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। তবে এ চেষ্টা করাকে আমি অপচেষ্টা বলে মনে করিনে। যে পেয়েছে সে অন্যকে তার আনন্দের ভাগ দিতে না পারলে খুশি হয় না। তাই শুধু 'কবিতার সুর' লিখে নয়, ত্রিবেণীর ভূমিকায় এবং আরো বহু বার বহু ভাবে এ কথাটা আমি বলবার চেষ্টা করেছি।

'কবিতার সুর' হল কবিতার অশরীরী আত্মা। আত্মাকে ঘিরে যেমন সুসমঞ্জস দেহ আত্মপ্রকাশ করে তেমনি কবিতার সুরকে ধরতে পারলে সুসমঞ্জস ভাব, ভাষা, ছন্দোবদ্ধ ইত্যাদি আপনা থেকেই এসে বসবে। সুরে ধরা কবিতা অর্থ করে লেখা যায় না, লিখে তার পর বসে ভেবে চিন্তে অর্থ বের করে নিতে হয়। এখন প্রশ্ন হল এই 'কবিতার সুর' জিনিসটা কি—'কবিতার সুর' বলে আমি কি বোঝাতে চাই? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যি কঠিন, কবি ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝাও কঠিন। যেমন মাত্রাবোধ বা লয়জ্ঞান যাদের

আছে তারাই ‘লয়’ বা ‘মাত্রা’ জিনিসটা আসলে কি ঠিক বুঝবে, এমন কি লয়জ্ঞানসম্পন্ন একটি ছেলে পর্যন্ত না বুঝেও ঠোকা দিতে ভুল করবে না, কিন্তু যাদের ওই জ্ঞানটুকু নেই হাজার বুঝিয়ে দিলেও ঠোকায় তাদের ভুল হতে পারে। কিছুটা সাধনাসাপেক্ষ হলেও মূল জিনিসটা আসলে জন্মের সঙ্গে পাওয়া, বুদ্ধি দিয়ে বা চেষ্টা করে সেটাকে ঠিক পাওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। শিল্প বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে। শিল্পী-সত্তা ছাড়া শিল্পজ্ঞান কারুকে দেওয়া যায় না বটে কিন্তু শিল্প, সাহিত্য বা কবিতা বুঝবার অনুভূতিগুলোকে ধারালো করে নেওয়া যায়।

বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। শিল্পে ভালো লাগার বড় কথা নেই, ‘কেন’র উত্তর দেওয়া চলে না, বোঝা চললেও বোঝানো চলে না। মানুষের মনে অসংখ্য সুপ্ত অনুভূতি রয়েছে—ঠিক সুখ দুঃখের অনুভূতির মতো। বড় কিছুকেই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়ে বাঁধা যায় না—সুখ দুঃখকেও না, শিল্পকে তো নয়ই। এ জিনিসগুলোকে অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করে নিতে হয়, অর্থাৎ এ জিনিসগুলো বুঝবার ইন্দ্রিয়গ্রাম হল আসলে অনুভূতি, প্রত্যেক মানুষেই যা সুপ্ত রয়েছে। গানের সুরে মুহূর্তে এ অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বেশীর ভাগ লোকের মনেই এ অনুভূতিগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে, চেষ্টা করলে বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলোকে কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় বা তীক্ষ্ণ করা চলে। তাতে করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখার বৈষম্য ধরা চলে, বা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের ছবির তফাৎটা কোথায় বোঝা যায় কিন্তু তাতে করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হওয়া চলে না। শুধু অনুভূতি বাড়িয়েই সেটা হওয়া যায় না, যারা বিশেষ বিশেষ কবি-সত্তা বা শিল্পী-সত্তা নিয়ে জন্মেছে তারাই শুধু তা হতে পারে।

শিল্পের পণ্ডিত হওয়া আর শিল্পী হওয়া এক কথা নয়। শিল্পের theory জানলেই পণ্ডিত হওয়া যায় কিন্তু শিল্পী হওয়া যায় না। থিয়োরি না জেনেও শিল্পী শিল্পী, শিল্পের থিয়োরি আসলে শিল্প-ভিত্তিক, তাতে বাগাড়ম্বরের তুলনায় সত্যের অংশ খুবই কম।

কবিতা জিনিসটা কি সে সম্বন্ধেও এ প্রসঙ্গে একটু বলা প্রয়োজন। ছন্দোবদ্ধ বাক্য কবিতা? বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্?—ছন্দোবদ্ধই যে কবিতা নয় কিংবা বাক্যকে রসে চুবিয়ে নিলেই যে কবিতা হয় না তার প্রচুর উদাহরণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে দেওয়া আছে। কবিতাটা স্বতঃসিদ্ধ, হলো তো হলো আর না হলো তো রসে নাকানি-চুবানি খাওয়ালেও হবে না। এখানেই কবির জিত, বোঝাতে না পারলেও মনে মনে তার কবিতা জিনিসটা কি জানা আছে। এর পরেই আসে কবিতার সুরের কথা, কবিতাটা আসলে সুরাধিগত। ফলে সুরের স্পর্শ পাওয়ামাত্র এটা যে গদ্য নয়, কবিতা —তা' আমরা বুঝতে পারি। আমাদের জানা নেই এমন যে কোন বিদেশী ভাষার কবিতা পড়ে গেলেও সেটা যে কবিতা, কিংবা গদ্য আর কবিতা পড়ে গেলে কোনটা গদ্য আর কোনটা কবিতা তা সঙ্গে সঙ্গেই যে কেউ বলে দিতে পারবে। আসলে সুরসংযোগ হলে কতকগুলি অর্থহীন (—অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও আসলে যা অর্থহীন নয়,—) শব্দ বা ধ্বনিপুঞ্জও কবিতা হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ আমার ত্রিবেণী বইএর সুদীর্ঘ কবিতা "আমার ঝংকার গর্ভে আনন্দের উত্থান পতন শব্দের আবর্তে বাঁধা জটামুক্ত ভাব-গঙ্গাধারা", বা রবীন্দ্রনাথের "দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব, মন বলে শুধু অসম্ভব এ অসম্ভব, (সানাই—অসম্ভব)—কবিতা দু'টির কথা বলা যেতে পারে। বাহির থেকে সব সময় অর্থ করা না গেলেও সুরে ব্যাপক অর্থ রয়েছে আর আমাদের মনে সেটা ঠিক

ধরাও পড়ে। আসলে রস পেয়ে গেলেই হল, এতো সব না বুঝলেও কিছুই যায় আসে না।

আসল কথায় ফিরে আসা যাক, কবিতার সুর সম্ভবতঃ কবিতার আত্মপ্রকাশের আকুতি। আগেই বলেছি, সেটা কবিতার আত্মা—মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো কবিতার অশরীরী আত্মা। কবির অবচেতন মনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে,—সেটা জন্মান্তরের হতে পারে, এ জন্মের তো বটেই কিংবা এও হতে পারে কিছু বেশী নিয়েই কবির জন্ম। চেতনা রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতার সুরের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে। ব্যাপারটা আসলে 'যৌগিক'। কবির মনের বিশেষ একটি তারের সঙ্গে যৌগিক প্রক্রিয়ায় এই মিলন ঘটে, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো বিশেষ বিশেষ ভাবেই সেটা ঘটে থাকে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, এই মিলনের পর কবিকে সাধ্যমতো প্রকাশের দায়িত্ব নিতে হবেই, আর কবির মন ভিতরের দিক থেকে এমন ভাবে গড়া যে কবিতার সুরের সঙ্গে এ মিলনও তার হবেই। ফলে অনেক সময় অন্তর-রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিকেও বাইরের দিক থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কবিতার এই আত্ম-প্রকাশ অন্যের কাছে যতোটা বিস্ময়ের ব্যাপার কবির নিজের কাছেও তার চেয়ে কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এ সম্বন্ধে এর বেশী কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না।

'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় বলেছিলাম "একই সময়ে লিখা বিভিন্ন কবিতা একই কবিতা হতে বাধ্য, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে লিখা কবিতার এক হবার সম্ভাবনা অল্প—অন্ততঃ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।" কথাটা ঠিক ভাবে বলা হয়নি, পরে বুঝেছি প্রায়ই এমনটি হলেও সব সময় তা না-ও হতে পারে। আসলে একই সুরে ধরা বিভিন্ন কবিতা একই কবিতা হতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি একই সুরে কবিতা লিখতে থাকা কালে সুরে এমন পরিবর্তন আসে যাতে

করে একই কবিতার দুই বিভিন্ন অংশ আকারে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কবিতার রূপ নেয়। নমুনা হিসেবে এই বইএর "নয়" সংখ্যক কবিতার কথা বলা যেতে পারে। একই সময়ের লেখা হলেও কবিতাটির দু'টি অংশের ছন্দোবন্ধ, ভাব ভাষা বা অর্থ কোন কিছুতেই মিল নেই। মনে হয় দু'টি পৃথক পৃথক কবিতা অথচ পৃথক বলে স্বীকার করতেও বাধে।

—১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫

আধুনিক কাব্য ও নিরাশাবাদ

(যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত, ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৬)

শুনতে পাই বাংলা কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আমি নিজে এক সময় কবিতা লিখতাম, কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' করতে গিয়ে কোথায় আমরা ভুল করে চলেছি সেটুকু আমি ঠিক বুঝতে পারি।

কবিতাটা মন্ত্রের মতো। মন্ত্রকে যেমন সাধনায় পেতে হয় কবিতাকেও পেতে হয় ঠিক তেমনি। হলো তো হলো—হলো না তো হলো না। হলে চিরদিন ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরবে। পদ্য কি গদ্য—সছন্দ কি ছন্দোহীন এ প্রশ্নই অবান্তর। এ শুধু আমার দেশের কথা নয়—সব দেশের কথা। গত দশ বারো বছর আধুনিক—অতি আধুনিক কবিদের কবিতার ছড়াছড়ি গেল বাংলাদেশে অথচ লোকের মুখে মুখে একটি কবিতার লাইন ফিরতে দেখলাম না, কোন বাঙ্গালী মনে রাখতে পারলে না একটি পংক্তি, অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—এ কেমন কবি আর কেমন কবিতা? বাংলাদেশের একটি লোকের মনে দাগ কাটলো না একটি পঙ্‌ক্তি এ কেমন? একজনও বলতে পারলে না,—রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। মধুচক্র রচনা করবার আর সুধা বিতরণ করবার ভার নেবার লোক কই?

কবিতার গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে এ আলোচনা নয়। 'কবিতার সুর' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলাম প্রায় বারো বছর আগে। তার পর কবিতা আর আমি লিখিনি বলা চলে। প্রথমতঃ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা-কাতরে কবিতা কুতঃ?' আর দ্বিতীয়তঃ দেখতে চেয়েছিলাম

সমুদ্রমন্থনে কোন্ অমৃত ওঠে? আজ মনে হচ্ছে দেখার শেষ হয়ে গেছে। মোটামুটি কথাটা এবার স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাই চলে থাক দরদী মন নিয়ে এর বিচার করতে হবে, মেনে নিতে হবে এর সত্যিকার মূল্যটাকে। চিরাচরিত পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথে এই যে দুঃসাহসী অভিযান, ব্যর্থ হলেও তার মূল্য অনেক—এই ব্যর্থতার ভিতরেই নিহিত রয়েছে এর অপরিসীম কীর্তি, কথাটা সত্যও হতে পারে। তবে এর জন্যে অপচয়ের যে মূল্য দিতে হয়েছে তা বড্ড বেশী।

এবার আসল কথায় আসা যাক। আমাদের এই যে ব্যর্থতা এর কারণ কি? আসলে হয় আমরা অন্যদেশের অনুকরণ করতে গেছি, নয় চেয়েছি অন্যদেশের কবিদের সঙ্গে গা-মিলিয়ে চলতে। এরি সঙ্গে কাজ করেছে রবি ঠাকুরের প্রভাব—তথা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব এড়িয়ে নতুন পন্থা অনুসরণের সক্রিয় ইচ্ছা। তাতে করে আমাদেব মূল সুর কেটে গেছে, নিজ স্বভাবে কিছুই গড়ে ওঠেনি। ফলে বিশ্বের কবিতার দরবারে দেবার অধিকার আমরা হারিয়েছি। অবশ্য অন্যকে অনুকরণ করেও দেওয়া হয় তো চলতো, কিন্তু পরের গান নিজের সুরে গাইবার মতো বিরাট প্রতিভাধর আমরা কেউই নয়। এ হলো আমাদের ব্যর্থতার প্রথম কারণ। নিজের সুরে নিজের গান যদি আমরা গাইতাম তা'হলে এমন ভাবে ব্যর্থ হয় তো আমরা হতাম না। দেশের লোকের মুখে মুখে, দু'চারটে গানের কলিও আমাদের অন্ততঃ ফিরতো। কিন্তু এখানে কবিগুরুকে ডিঙিয়ে কিছু করতে পারবো কি না এ সন্দেহ আর ভয় আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। নিছক নূতন কিছু করার ঝোঁকে বা অনুকরণ করবার জন্যেই আমরা কিছু করতে গিয়েছিলাম এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনে।

দ্বিতীয় ভুল করেছি আমরা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার গান গাইবার চেষ্টা করে। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা বলে আমি এ কথা বোঝাতে চাচ্ছি—যে-সভ্যতার পরমায়ু ক্ষয়িয়ে এসেছে, বিশেষ করে পশ্চিমী সভ্যতার কথা—যাদের দেবার আর কিছুই নেই। ওদের সভ্যতা আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যেখান থেকে মোড় ঘোরানো সম্ভব নয়, একেবারে ভেঙেচুরে নূতন করে আবার ঢেলে সাজতে হবে। যা আছে তা হতাশ করছে মানুষকে। ওদেশের কবিরা আজ পথ খুঁজে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না আশার আলো। তাদের সুর তাই নিরাশাবাদে ভরে উঠতে আজ বাধ্য। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তফাৎ অনেক। ফলে পশ্চিমী সভ্যতার সবিক রাশিয়ায় যা হয়েছে, চীনে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। আব ভারতবর্ষের বেলায় এসব কোন কথাই খাটে না, ভারতবর্ষ এখানে একক। ভারতবর্ষের সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতাই নয়। দু'হাজার বছর নয়, হাজার হাজার বছর পরীক্ষণের পর বনেদ তৈরি হয়েছে এ সভ্যতার, তার পর তার বৃদ্ধির রয়েছে অনন্ত অবকাশ। ফলে জোর করে বা ধার করে আনা নিরাশাবাদ এখানে অচল। এটা হলো বর্তমানে আমাদের কাব্য-জগতে ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ।

এবার আমাদের ভেবে দেখতে হবে, নিরাশাবাদীদের সঙ্গে তাল রেখে গান গাওয়ার আমাদের সত্যিকার কোন কারণ আছে কি না। প্রাচীন বলেই কোন জিনিস অকেজো হয়ে গেল তা যেমন সত্য নয়, তেমনি পুরানো বলেই ভেঙে ফেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রথম জানা দরকার কি আমরা করতে চাই, তার পর সেই বনেদের ওপর আমরা যা করতে চাই তা করা সম্ভব কি না আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের যা হওয়া উচিত ছিল তা যে হয়নি এ কথাটা আমরা আজ ভালো ভাবেই বুঝতে পারছি।

একই অর্থনীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে সমস্ত দুনিয়া আবদ্ধ। এখানে খুশিমতো চলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—একা চলা বা এর বন্দে ভেঙে ফেলার কথাও হাস্যকর। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে বাইরের সংযোগ অক্ষুন্ন রেখে রইয়ে-সইয়ে দেশের ভিতর একটা সাম্য অবস্থা আমরা নিয়ে আসতে পারি, অবসান ঘটাতে পারি শোষিত ও শোষক শ্রেণীর। অথবা সরাসরি বিপ্লবের পথে রাতারাতি পরিবর্তন করাও অসম্ভব নয়। এ আমরা পারি, কাজেই নিরাশাবাদী হওয়ার সত্যিকারের আমাদের কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আজ আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীর হস্তক্ষেপকে রুখতে আমাদের কোন বাধাই যখন নেই তখন আমাদের নিরাশাবাদী হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। এর পরই আসে রাজনীতি আর সমাজনীতির কথা। রাজনীতি-ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পর আজ আমরা স্বাধীন। কোথায় আজ আমরা নতুন উদ্যমে উৎসাহে ফেটে পড়বো, তার বদলে পরাধীন থাকা কালেও যে সুর আমাদের কবিতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি আজ হঠাৎ নিরাশাবাদের সে-সুর আমাদের কবিতায় এলো কি করে ভেবে পাইনে। আর সমাজনীতির ক্ষেত্রে আইন করেও যা-খুশি করবার ক্ষমতা তো আমাদের হাতেই রয়েছে, ক্ষতি কি আমাদের কি আছে তা না হয় পরেই খতিয়ে দেখলাম। এ ছাড়া যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হতে বাধ্য। আমাদের নিরাশা-বাদী হবার সত্যিকার কারণ কোথায়?

এর পর বক্তব্য, ধার করে শব্দ এনে, দল বেঁধে 'খুব ভালো' কবিতা হয়েছে' বলে বা মিছিল করে 'কবিতা পড়' চীৎকার করলেই কোন জাতি সেটাকে গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সেটা তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব ভাবধারায় সমৃদ্ধ কবিতা হয়ে

গড়ে ওঠে। জাতিকে নূতন উদ্যমে-উৎসাহে-আশায়-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে যে কবি সে-কবি আজ কোথায়? একমাত্র জাতির কবিই জগতের কবি হতে পারে। বাঙ্গালী কবির জাত, কাব্য-প্রীতি বাঙ্গালী হারাতে পারে না।

প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচী

পৃষ্ঠা